স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ছিল? (ক. বি. ২০০২)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বকে কোনও মাপকাঠি দ্বারা বিচার করা দুঃসাধ্য কারণ ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলন বিশাল হলেও এই আন্দোলনে সংগ্রামের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের দিশারী। এই আন্দোলনের প্রকৃতি অন্য সকল আন্দোলন থেকে পৃথক ছিল। কেবল মাত্র রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা তথা সারা ভারতের জনজীবনে প্রতিটি স্থানে, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রথম স্বতন্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ব্রিটিশ বিরোধিতার সুর এর পূর্বে এত বড় আকারে দেখা যায়নি। আগের আন্দোলনগুলিতে ব্রিটিশ আনুগত্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলেও এই আন্দোলনে এ ধরনের নাটক প্রকৃতই অস্পষ্ট ছিল। স্বদেশী আন্দোলনই প্রথম আন্দোলন যেখানে ছাত্র ও নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এ কথা স্বীকার করা যায় যে, ১৯১৯-২২, ১৯৩০-৩৪, ১৯৪২ ও ১৯৪৪-৪৫ সালে গণ-অভ্যুত্থানের তুলনায় স্বদেশী আন্দোলন অনেক কম

Scanned with CamScanner

কার্যকরী ছিল। এ কথাও স্বীকার্য যে, কিছু শ্রমিক ছাড়া অধিকাংশ নিম্নবর্গের মানুষ এবং কৃষক সম্প্রদায়ই এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। পরবর্তী কালের আন্দোলনগুলির সাথে এর তুলনা করাটা অযৌক্তিক, সমাজের সকল স্থানের মানুষ এতে যোগদান না করলেও, সমাজের একটা বড়ো অংশ এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলন মূলত নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতার ফলেই গড়ে উঠেছিল। ইংরেজদের তোষণ করে চললেও যে, বঙ্গভঙ্গকে রোধ করা যায় না সে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছিল সকলের সামনে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এর প্রয়োগ শুরু হয়। অপর দিকে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলে জাতীয় শিক্ষা ও সমিতি গড়ে উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে বেশ কিছু স্বদেশী বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালাতে থাকে। এই আন্দোলনই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর আন্দোলন। তাই জাতীয় মর্যাদা, সম্মান ও আস্থা পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের গুরুত্ব কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবে স্বদেশী আন্দোলন বাংলা সংগীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্র শিল্প সকল দিকে প্রভাব ফেলেছিল। সুমিত সরকারের মতে, 'No other phase of our national movement can boast of Cultural accompaniment as rich as Swadeshi'।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে সকল সংবাদ পত্র ও সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এই সময় অসংখ্য কবিতা ও গানের মাধ্যমে দেশ প্রেমের বাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-ই হোক বা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' বাংলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি মুকুন্দ দাসের লেখনীও উল্লেখযোগ্য। কবি ইসমাইল হোসেনের *অনল প্রবাহে* কাব্যগ্রন্থে হিন্দু ও মুসলিম উভয় জাতিকেই ভারতমাতার সন্তান হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। গ্রাম বাংলার পল্লীগীতি ও বাউল গানের মধ্যেও স্বদেশী বা তার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* ও *গোরা* এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছিল, দুইজন অপরিচিত ঔপন্যাসিক গঙ্গাচরণ নাগ ও

Scanned with CamScanner

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্যে লেখনীতেও এই প্রেক্ষাপট ধরা পড়েছে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লেখা বিভিন্ন ছোট গল্প, যেমন *খালাস, উকিলের বুদ্ধি* ও *হাতেহাতে ফল*-ও একই বিষয়ের উপর রচিত।

এই সময় বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে *আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, স্বদেশ সমাজ, শিক্ষা, সমূহ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম চৌধুরির *ভারত* পত্রিকায় *বয়কট ও স্বাদেশীকতা* ইত্যাদি নামে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

অপর লেখকদের মধ্যে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয়। এরপর ১৯০৪-০৭ পর্যন্ত-এর সম্পাদক রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে তা সাহিত্য চর্চার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠান বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিখিলনাথ রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিক আমাদের ইতিহাসের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। *Dawn* পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তরুণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তুললেন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। এর সদস্যরা হলেন কুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারানচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয় কুমার প্রমুখ ব্যক্তিরা। তরুণ লেখক ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার *India of Auranzeb* রচনা করেন এই সময়। স্বদেশিকতার আদর্শ বাঙালীকে বিজ্ঞান সাধানায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেছিল, এই সময় দুই দিকপাল বিজ্ঞানী—আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালীকে গর্বিত করেছিল। জগদীশ চন্দ্র তাঁর Plant Response Theory-র জন্য বাঙালী মনস্কে উচ্চস্তরে আসীন হয়ে আছেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের স্বদেশিকতার সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল এটি। এদের বিজ্ঞান চর্চার আদর্শ জাতীয়তাবোধের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্রফুল্ল চন্দ্রের লেখা তাঁর স্বদেশ প্রীতির ও গবেষনার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকল। এই দুই বিজ্ঞানী ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে আরও অনেক তরুণ বিজ্ঞানীর আর্বিভাব ঘটে—রসিক লাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রীয় রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে নাটোরের মহারাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগীত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক

Scanned with CamScanner

কার্যকলাপের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ও কাকুরা, নিবেদিতা ও হ্যাভেলের প্রাচ্য আদর্শ ও চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাইমান, হিসিদা প্রভৃতি জাপানি চিত্রকরদের সান্নিধ্য লাভ করে নতুন চিত্রশৈলীর প্রবর্তন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে ভারতীয় চিত্র কলার ইংল্যান্ডের ভিক্টরীয় যুগের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। চিত্রকলা চর্চার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাস নাগাদ Indian Society of Oriental Art প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর আয়োজন করত। মেধাবী চিত্রশিল্পীদের বৃত্তির ব্যবস্থাও করত। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এখান থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। এই সময়কার শিল্পীরা তাদের চিত্রে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ছবি দেখে ভগিনী নিবেদিতা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলেন।

বয়কট ও স্বদেশী বাঙালীর সকল চাহিদাপূরণ করতে পারেনি। তার সত্ত্বেও এর একটি ভালো দিক ছিল। আগেকার আন্দোলনগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিমত লক্ষ করি। যেমন ইংরেজ বিরোধিতা বা ইংরেজ তোষণ—যে কোন ক্ষেত্রেই এদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু বয়কট বা স্বদেশীর ক্ষেত্রে কোনরকম ভনিতা ছিল না। এই আন্দোলনে স্বদেশ প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। দেশকে ভালোবাসার যে আবেগ, উচ্ছ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল, তা এই আন্দোলনে অনেকটা লাঘব করা গিয়েছিল। যার প্রভাব বিপিন চন্দ্রের কথায় স্পষ্ট হয়েছিল—'This new love is not as of old, a vague sentiment and a fairy fancy .... but something real and true not merely a subjective attitude, but something that yearns for an objective expression and realisation, through acts and symbols, as always, happens with all real and true love'।

স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেনি। এটাই সবচেয়ে বড়ো সীমাবদ্ধতা। এই আন্দোলনে প্রান শক্তি ছিল বাঙালীর নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ, বাস্তবে স্বদেশী আন্দোলনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে সর্বভারতীয় প্রভাব ছিল সেটা অনস্বীকার্য। ভারতের সকল মানুষকে ঐক্য বদ্ধ করার জন্য ১৯০৭ সালে কলকাতায় 'এক লিপি বিস্তার পরিষদ' গঠিত হয়। এতে দেবনাগরি অক্ষরের ব্যবহারের জন্য সুপারিশধারা হয়। উইল ডুরান্ডের মতে, 'It was in 1905 that the Indian revolution began'। গোখলের মত নরমপন্থী নেতারা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

মহাত্মা গান্ধির ভাষায় 'After the partition people saw that petitions must be backed up by force and that they must be capable of suffering'। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন পথের দিশারী।

Scanned with CamScanner